OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 09
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 64 - 76
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 64 - 76
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার গতিপ্রকৃতি : শুরু থেকে চল্লিশের শেষ

ড. কল্যাণ মজুমদার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
লালবাবা কলেজ
Email ID: kalyankushalmazumder@gmail.com
0009-0000-0909-1488

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Modern Bengali Poetry, Rabindranath Tagore, Post-Tagorean Modernism, Imagery and Symbolism, Romanticism and Realism, Kallol Era, Jibanananda Das, Sudhindranath Dutta, Buddhadeb Basu, Amiya Chakrabarty, Bishnu Dey, Historical Consciousness, Marxist Influence, World War and Famine, Poetic Transition, Partition of Bengal.

Abstract
Departing from the obscurities of the medieval period, Michael Madhusudan Dutt (1824-1873) was the first poet in Bengali literature to articulate, through his works, the diverse sensibilities of a modern consciousness. The defining features of modern literature—individuality and the assertion of selfhood—were most prominently realized in his poetry. Biharilal Chakraborty's (1835—1894) inclination to voice personal sentiments in an authentic idiom found a fuller and more accomplished expression in the poetry of Rabindranath Tagore (1861—1941), who engaged with multiple strands and possibilities of modernity. Nevertheless, the emergence of genuine modernism in Bengali poetry was ultimately conditioned by the necessity of transcending Tagore's overwhelming influence.

The earliest conscious desire to liberate Bengali poetry from the overwhelming influence of Rabindranath Tagore was most distinctly articulated by the poets of the 'Kallol' group. Yet, even prior to them, Kazi Nazrul Islam (1898–1976) had, perhaps unwittingly, with his rebellious, fiery verse freed himself from the spell of Tagore's influence, but the decisive breakthrough arrived with the 'Kallol' group. Journals like 'Kallol' (1923), 'Kalikalam' (1926), 'Pragati' (1927), 'Parichay' (1931), and later 'Kobita' (1935) created platforms for a radically modernist generation of modern Bengali Poetry.

This new poetry was inseparable from its turbulent historical context: the First and Second World Wars, the Russian Revolution, India's Non-Cooperation Movement, the Great Depression, and the rise of Marxist ideology. Against this backdrop, the 1930s produced some of the most remarkable poets in Bengali literature. Jibanananda Das (1899–1954) became a central voice with his haunting imagery, skepticism, and unique meditative tone. Sudhindranath Dutta (1901–1960) emphasized classical discipline, dense intellectualism, and impersonality. Buddhadeb Basu (1908–1974)

championed modernism through lyrical romanticism, frank sensuality, and aesthetic delight. Amiya Chakravarty (1901–1986) combined scientific rationality with spiritual quest, while Bishnu Dey (1909–1982) brought Marxist thought, historical awareness, and realist concerns into poetry. Alongside them, poets like Premendra Mitra (1904–1988), Ajit Dutta (1907–1979), and Achintyakumar Sengupta (1903–1976) enriched the movement with varied stylistic experiments.

The 1940s brought further transformation under catastrophic events—World War II, the Bengal Famine of 1943, communal riots, the struggle for Independence, and Partition. Poetry now became more overtly political and socially committed. Sukanta Bhattacharya (1926–1947), who died tragically young, emerged as a symbol of revolutionary hope and youthful defiance, while Birendra Chattopadhyay (1920–1985) and Ram Basu articulated leftist ideals and collective struggle. Yet not all poets turned activist; some, like Ashok Bijoy Raha (1915–1997), Arun Kumar Sarkar (1919–2001), and Naresh Guha (1923–2009), retained a lyrical attachment to nature and beauty. Others, such as Arun Mitra (1909–2000) and Jyotirindranath Maitra (1911–2000), attempted a balance between realism, social consciousness, and humanist values.

Thus, from the beginning of 1930s through the late 1940s, Bengali poetry underwent a vibrant and multi-layered transition. Beginning with a conscious break from Tagore's dominance, it moved through experimental modernism, embraced skepticism and historical awareness, and finally reached politically engaged verse that voiced hunger, protest, and the dream of social transformation. These decades decisively shaped the foundation of post-Independence Bengali poetry, ensuring its richness, diversity, and modernity.

Discussion

মধ্যযুগীয় আলো অন্ধকারের পথ থেকে সরে এসে বাংলা ভাষায় কবি মধুসূদন দত্তই তাঁর কাব্যে প্রথম প্রকাশ করেছিলেন আধুনিক মননের বিচিত্র অনুভূতিমালাকে। আধুনিক সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং আত্মমর্যাদাবোধ, তা মধুসূদনের কাব্যেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। আর বিহারীলাল চক্রবর্তীর নিজের সুরে নিজের মনের কথা বলার আগ্রহকে সার্থক রূপ দিয়ে রবীন্দ্রনাথই প্রথম তাঁর কবিতায় স্পর্শ করেছিলেন আধুনিকতার বিভিন্ন সূত্র ও সম্ভাবনাকে। কিন্তু বাংলা কবিতায় প্রকৃত আধুনিকতা এসেছিল রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রমের অভিপ্রায়েই।

বাংলা কবিতার আধুনিকতার রূপরেখাটি ঠিক কীরকম তার যথার্থ নির্দেশনা আমরা পেয়েছিলাম বুদ্ধদেব বসুর 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' নামক প্রবন্ধ থেকে। বিশ শতকের শেষপ্রান্তে তো বটেই আরও পরবর্তীকালেও যতদিন বাংলা ভাষার অস্তিত্ব থাকবে ততদিন বাংলা কবিতার আধুনিকতার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ থাকবেন অনিবার্যভাবেই।

> "বাংলা সাহিত্যে আদিগন্ত ব্যাপ্ত হয়ে আছেন তিনি, বাংলা ভাষার রক্তে মাংসে মিশে আছেন; তার কাছে ঋণী হবার এমনকি তাকে অধ্যয়নেরও আর প্রয়োজন নেই তেমন, সেই ঋণ স্বতঃসিদ্ধ বলেই ধরা যেতে পারে-শুধু আজকের দিনে নয়, যুগে-যুগে বাংলা ভাষার যে-কোনো লেখকের পক্ষে। আর যেখানে প্রত্যক্ষ ভাবে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে যাবে, সেখানেও সুখের বিষয়, সম্মোহনের আশঙ্কা আর নেই, রবীন্দ্রনাথের উপযোগিতা, ব্যবহার্যতা, ক্রমশই বিস্তৃত হয়ে বিচিত্র হয়ে প্রকাশ পাবে বাংলা সাহিত্যে।"[১]

রবীন্দ্রনাথের সম্মোহন থেকে বাংলা কবিতার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সর্বপ্রথম সচেতনভাবে জেগে উঠেছিল কল্লোল-গোষ্ঠীর কবিদের মধ্যে। এই কবিদের মধ্যে কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটিয়ে সরে গেছেন আর কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথকে আত্মস্থ করেই শক্তি পেয়েছেন তাঁর কাছ থেকে। অবশ্য এঁদেরও আগে নিজের অজান্তেই যিনি রবীন্দ্রসম্মোহন থেকে মুক্ত

হয়েছিলেন তিনি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৮-১৯৭৬)। নজরুলই প্রথম তাঁর সমকালীন বাস্তবতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় লেখা কবিতার মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন যে –

> "রবীন্দ্রনাথের পথ ছাড়াও অন্যপথ বাংলা কবিতায় সম্ভব। যে আকাঙ্ক্ষা তিনি জাগালেন, তার তৃপ্তির জন্য চাঞ্চল্য জেগে উঠল নানা দিকে, এলেন 'স্বপন পসারী'র সত্যেন্দ্র-দত্তীয় মৌতাত কাটিয়ে, পেশীগত শক্তি নিয়ে মোহিতলাল, এলো যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অগভীর-কিন্তু তখনকার মত ব্যবহারযোগ্য বিধর্মীতা, আর এইসব পরীক্ষার পরেই দেখা দিল 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর নতুনতর প্রচেষ্টা; বাংলা সাহিত্যের মোড় ফেরার ঘণ্টা বাজলো।"[২]

বাংলা সাহিত্যের এই মোড় ফেরার ক্ষেত্রে পাঁচটি পত্রিকার ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি হল - কল্লোল (১৯২৩), কালিকলম (১৯২৬), প্রগতি (১৯২৭), পরিচয় (১৯৩১) এবং কবিতা (১৯৩৫)। কবিতা কেন, শিল্পসাহিত্যের যে কোনরকম পালাবদলের ক্ষেত্রেই যুগচৈতন্যের বিশেষ ভূমিকা থাকে। আসলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত পৃথিবীতে বদলে যায় মানুষের মূল্যবোধ। একসময় যে ধারণাকে মনে হয় সনাতন, নানা আর্থ সামাজিক ঘটনা এবং ভাববিপ্লবের আবর্তে বদলে যায় তার অভিমুখ। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) নারকীয়তা যেমন করে রবীন্দ্রমানসের ভাবনার অভিমুখ বদলে দিয়েছিল, তেমনি করে রবীন্দ্র পরবর্তী বাঙালি কবিদের চিন্তাস্রোতকে, তাদের সনাতন মূল্যবোধকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৪১-৪৫)। এছাড়া ইতিপূর্বে ঘটে যাওয়া বেশ কিছু দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাও এই সময়কার কবিদেরকে নতুনভাবে ভাবিয়েছিল জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে। এইসব ঘটনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০), রুশবিপ্লব (১৯০৭), কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা (১৯২৭-২৮), মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৯), বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার ঘটনা ইত্যাদি।

বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রানুসারী কবি বলে যারা পরিচিত সেই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫), কিরণধন চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৭-১৯৩১)-এর পরে নতুন ভাবপ্রবাহ এসেছিল কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৮-১৯৭৬), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) এবং মোহিতলাল মজুমদারের (১৮৮৮-১৯৫২) হাত ধরে। তারপর যারা কল্লোলের কলরোলের সঙ্গে যুক্ত থেকে বাংলা কবিতাকে প্রকৃত অর্থে আধুনিকতার পথে চালিত করেছিলেন তারা তিরিশের কবি হিসাবে পরিচিত। দশক পরিচয়ে কবিদের পরিচিত করবার প্রচলন এই তিরিশের দশকের কবিদের মাধ্যমেই শুরু হয়। এই কবিদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০৯-১৯৮৬), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২)। এই কবিদের সকলের কৈশোর ও যৌবনকালে বাংলা সাহিত্যে প্রবলভাবে সক্রিয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথকে আত্মস্থ করেই রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন এঁরা।

কাব্য সমালোচকদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই যে, বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই বাংলা কবিতা বদলে যায় গুণগতভাবে। এই আধুনিকতা ভাব এবং রূপ, দু'দিক থেকেই এসেছিল বাংলা ভাষায়। কবিতার ইতিহাস আসলে তার নির্মিতির এবং রূপান্তরের ইতিহাস। যে কোন কবিতায় কী বলা হল, সেটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি সমান গুরুত্বপূর্ণ হল কীভাবে বলা হল।

> "ছন্দের নানান ভাঙাগড়ায় বাগর্থের সাবেক জোড় ভেঙে, শব্দের সামর্থ্যের সীমা বাড়িয়ে নতুন অর্থে পুরনো শব্দকে ব্যবহার করে, প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গকে নতুন মাত্রায় ব্যবহার করে নতুনতর স্বরায়ণের মাধ্যমে একজন আধুনিক সাহিত্যিক, ধরা যাক কবি, যথার্থ আধুনিক হয়ে ওঠেন।"[৩]

অবশ্য একথা সত্যি যে বিষয় বা ভাব বোধহয় যুগে যুগে থেকে যায় প্রায় একইরকম। মূলত বেশি করে বদলে যায় যা তা হল ভাবপ্রকাশের পদ্ধতি। রবীন্দ্রনাথ এবং তার উত্তরসাধকদের মধ্যে মূলত আছে কবিভাষার পার্থক্য। আর এই ভাষা ও শৈলীগত ভিন্নতার জন্যই একই বক্তব্য হয়ে যায় আলাদা বচন। নতুন মূল্যবোধ, বিশ্বাস, বিশ্বাসভঙ্গ, পৃথিবীর নানা ঘটনাক্রমে বদলে যায় কবিতার ভাষা। বাংলা ভাষায় কবিতার যে আধুনিকতা তার চরিত্র-লক্ষণ, তার বৈশিষ্ট্যের মূল সূত্রগুলি এরকম -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 09
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 64 - 76
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"(ক) আধুনিক কবিতা দেশবিদেশের সমাজ-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ওঠাপড়ার সঙ্গে সমন্বিত,
(খ) চিন্তা চেতনায়, প্রকাশ ভঙ্গিমায় মূলত নাগরিক,
(গ) সংশয় সন্দেহ বিষাদ ক্লান্তি ক্রোধ এবং অচরিতার্থতার সার্থক প্রকাশ এর বৈশিষ্ট্য,
(ঘ) সাম্যে আস্থাবান, সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাসী এবং ক্ষেত্র বিশেষে আশাবাদীও,
(ঙ) প্রেমের তথাকথিত পবিত্রতায় সংশয়ী, গোপন ও প্রকাশ্য যৌন কামনার অলজ্জিত প্রকাশে উজ্জ্বল,
(চ) পাণ্ডিত্যময়, দেশিবিদেশী পুরাণের নবীকরণে পারঙ্গম,
(ছ) শব্দার্থের পুরনো আভিধানিক বোধ ভেঙে নতুন অনুষঙ্গে তার প্রয়োগে পটু, দুরূহ তৎসমতার পাশাপাশি কথ্য শব্দাবলী, এমনকি অশ্লীল শব্দের সঠিক সাবলীল ব্যবহারে কৃতকার্য,
(জ) পরিমিতিবোধ সম্পন্ন, অতিকথন বর্জিত কথনরীতিতে বিশ্বাসী, বুদ্ধিদীপ্ত,
(ঝ) উপমা-চিত্রকল্প নির্মাণে অবিশ্বাস্য উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রকাশে প্রাণবান, ক্ষেত্রবিশেষে ইন্দ্রিয়বোধের সচেতন বিপর্যয় (Synasthesia) ঘটিয়ে মগ্ন চৈতন্যের মূল পর্যন্ত কল্পনাকে নিয়ে যাবার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব, বিরোধাভাস ও বক্রোক্তির অভিনব ব্যবহারে আগ্রহী,
(ঞ) প্রশ্নমুখর, প্রতিবাদী, বিদ্রুপপ্রবণ,
(ট) ছন্দ নিয়ে নানা পরীক্ষায় আগ্রহী, ক্ষেত্রবিশেষে ছন্দকে সম্পূর্ণ অস্বীকারেও অবিচল,
(ঠ) বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক ব্যবধানকে নিপুণভাবে বজায় রাখায় কুশলী, কখনো বা আত্মাধিক্কার এবং আত্মবিদ্রূপপ্রবণ,
(ড) কোনো রকম ছুৎমার্গ না রেখে বিষয় নির্বাচন এবং তার প্রকাশক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মুদ্রা, মুদ্রাদোষ অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে কবির স্বাভাবিকতা এবং স্বাতন্ত্র্যকে সম্মানিত করায় তৎপর।"[৪]

বাংলা কবিতায় এই আধুনিক লক্ষণ সর্বপ্রথম অনেকটা সার্বিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল জীবনানন্দ দাশের 'ঝরা পালক' (১৯২৭) কাব্যগ্রন্থে। বাংলা আধুনিক কবিতার নতুন স্বর জীবনানন্দের মধ্যেই সর্বাধিক স্পষ্টতায় প্রকাশিত। সংশয়-বিক্ষুব্ধ যুগের সংশয়ী মানবাত্মার ক্ষতবিক্ষত পরিচয় ফুটে উঠেছে জীবনানন্দ দাশের কবিতায়। সংশয়-সঙ্কুল আধুনিক যুগের কবি বলেই জীবনানন্দের কবিতায় ইয়েটসের মতই পাওয়া যায় –

> "a record of the struggles, creative and stimulating in themselves of a scrupulously honest human mind engaged in an heroic endeavour to know reality, and of those other struggles suffered by a representive modern man would establish "Unity of Being" within himself in despite of the world."[৫]

তিরিশের অন্যান্য আধুনিক কবিদের মত জীবনানন্দও চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত হতে। তবে অন্যান্যরা যেখানে সরাসরি রবীন্দ্রনাথের কবিতার পঙক্তি ও ভাব ব্যবহার করেছেন, জীবনানন্দ সেখানে পাশ কাটিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথকে। আর তাঁর কাব্য প্রকরণ বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ অভিনব। তাঁর চিত্ররূপময় দৃশ্যগন্ধস্পর্শময় কবিতা বাঙালি পাঠককে কাব্যপাঠের সম্পূর্ণ এক নতুন অনুভূতির সন্ধান দিয়েছে -

"দেখেছি সবুজপাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মত রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হ'য়ে ঝরেছে দু-বেলা
নির্জন মাছের চোখে; পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ-মেয়েলি হাতের স্পর্শ ল'য়ে গেছে তারে;
মিনারের মত মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
বেতের লতার নিচে চড়ুয়ের ডিম যেন নীল হ'য়ে আছে,

নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার-বার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে;
বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ-বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে;”[৬]

জীবনানন্দই রবীন্দ্র পরবর্তী আধুনিক বাংলা কাব্যধারার পথ প্রদর্শক। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ঝরা পালক’ (১৯২৭) থেকে শুরু করে ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ (১৯৩৬), ‘বনলতা সেন’ (১৯৪২), ‘মহাপৃথিবী’ (১৯৪৪), ‘সাতটি তারার তিমির’ (১৯৪৮), ‘রূপসী বাংলা’ (১৯৫৭) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে যথার্থ আধুনিক মননের স্বরূপ ও তার বাক্‌রীতির অভিনবত্ব প্রকাশিত।

> “তিনি কাব্যজগতে স্থির আদর্শ ও প্রত্যয় নিয়ে যতটা না নিজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, তার থেকে অনেক বেশি পরবর্তীকালের কাব্য প্রবাহকে প্রভাবিত করেছেন।”[৭]

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ‘ক্রন্দসী’ (১৯৩৭), ‘অর্কেস্ট্রা’ (১৯৩৫), ‘সংবর্ত’ (১৯৫৩), ‘দশমী’ (১৯৫৬) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে আছে ধ্রুপদী শিল্পীর নিষ্ঠা, আছে প্রতীকী কবিদের “সংহত ব্যঞ্জনাধর্মী স্বল্পভাষ কাব্যাদর্শ, অতিন্দ্রীয়তার স্থলে ইন্দ্রিয়ঘনতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে নৈর্ব্যক্তিকতা এবং প্রেরণার পরিবর্তে অভিজ্ঞতা ও অধ্যবসায়।”[৮]

বাংলা আধুনিক কাব্যান্দোলনের ইতিহাসে বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতা’ এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ‘পরিচয়’ এই দু’খানি পত্রিকার ভূমিকা সমান গুরুত্বপূর্ণ। সুধীন্দ্রনাথ দত্তই প্রথম জানালেন যে কবিতা অনেক সময়ই অনুশীলন সাপেক্ষ শিল্পকর্ম, আর সে অনুশীলন কবির দিক থেকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি পাঠকের দিক থেকেও। সুধীন্দ্রনাথই প্রথম স্পষ্টভাষায় বললেন যে –

> “কাব্যের মুক্তি পরিগ্রহণে; এবং কবি যদি মহাকালের প্রসাদ চায় তবে শুচিবায়ু অবশ্য বর্জনীয়।”[৯]

তিরিশের অন্যতম প্রধান কবি বুদ্ধদেব বসু মূলত রোম্যান্টিক। কিন্তু তার রোম্যান্টিকতা স্বভাবে ও ধর্মে রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিকতার চেয়ে আলাদা। অতীন্দ্রিয় স্বপ্নপ্রয়াণ নয়, এই দেহ মনের সব কামনা বাসনা নিয়েই বুদ্ধদেব প্রকাশ করেন আত্মসচেতন রোম্যান্টিকতা —

“তাই আজ ভাবি মনে মনে –
পঙ্কের কলঙ্ক - বারি উত্তরিয়া আছে মোর স্থান
পঙ্কজের শুভ্র অঙ্কে।
শেফালিসৌরভ আমি, রাত্রির নিশ্বাস,
ভোরের ভৈরবী।
সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কন্টকের তুচ্ছ উৎপীড়ন
হাস্যমুখে উপেক্ষিয়া চলি।
যেথা যত বিপুল বেদনা,
যেথা যত আনন্দের মহান মহিমা—
আমার হৃদয়ে তার নব-নব হয়েছে প্রকাশ।
বকুলবীথির ছায়ে গোধূলির অস্পষ্ট মায়ায়
অমাবস্যা - পূর্ণিমার পরিণয়ে আমি পুরোহিত—
শাপভ্রষ্ট দেবশিশু আমি!”[১০]

রবীন্দ্র প্রভাবকে অতিক্রম করবার সচেতন ইচ্ছেয় বাংলা আধুনিক কবির বিদ্রোহ প্রথম সার্থক রূপ নিয়েছিল বুদ্ধদেব বসুর ‘বন্দীর বন্দনা’য় (১৯৩০)।

> “কামনার অলজ্জিত প্রকাশে বুদ্ধদেবের ‘বন্দীর বন্দনা’য় কবিতার যে নান্দীপাঠ হয়েছিল, ‘কঙ্কাবতী’, ‘দ্রৌপদীর শাড়ি’ প্রভৃতি পার হয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নতুন যৌবনের দূত থেকে গেছেন।”[১১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 09
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 64 - 76
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রবীন্দ্রনাথও ছিলেন যৌবনের পূজারি, যৌবনের জয়গানে মুখর তাঁর 'বলাকা'র গতিবাদ এবং যৌবনতত্ত্বের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু বুদ্ধদেবের কাছে যৌবন অনেক সময় অভিশাপমাত্র। কারণ যৌবন দেহজ কামনাকে অস্বীকার করতে পারে না।

> "এইখানেই অনিবার্যভাবে এল আধুনিক মানসের অন্তর্দ্বন্দ্ব। প্রশ্ন জাগল মানুষ কি তবে দুর্বল, ভঙ্গুর, পঙ্গু, অসহায়? এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ কবির ঐতিহ্য ও শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব অনুভূতির সংঘাত; উপনিষদের মন্ত্র ও ভিক্টোরীয় পিউরিট্যানিজমের সঙ্গে আধুনিক জীববিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের বিরোধ।"[১২]

তিরিশের কবিদের মধ্যে যে কবি প্রগাঢ় আস্তিক্যবোধে সমাহিত, তিনি অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬)। কারো কারো মতে রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক চেতনার একমাত্র উত্তরাধিকারী তিনি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের "মিস্টিক চেতনা প্রধানত পারিবারিক ঐতিহ্য ও স্বকীয় অধ্যাত্ম উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত-কিছুটা অভ্যাসগত, কিছুটা বোধিলব্ধ এবং সবটাই অতীন্দ্রিয়। অমিয় চক্রবর্তীর মরমিয়াবাদের ভিত্তি হ'ল বিজ্ঞানচেতনা-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগৎ তার কাব্যরচনার কেন্দ্রে।"[১৩] একথা সত্যি যে আধুনিক কবিদের মধ্যে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় অনেক ক্ষেত্রেই প্রধান হয়ে উঠেছে আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা। তবে তাঁর আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসায় রয়েছে বিশ্বরহস্য অনুধাবনের প্রচেষ্টা। কবি একসময় বুঝেছেন শুধু বিজ্ঞান ও বস্তুচেতনা দিয়ে বিশ্বরহস্যের অনুধাবন সম্ভব নয়। তাঁর 'খসড়া' (১৯৩৮), 'একমুঠো' (১৯৩৯), 'মাটির দেয়াল' (১৯৪২), 'অভিজ্ঞান বসন্ত' (১৯৪৩) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের নানা কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে বিজ্ঞানচেতনার সঙ্গে কবির ধ্যানের এবং উপলব্ধির সমন্বয়ের কথা। কবি বিশ্বাস করেছেন শুধুমাত্র দৃষ্টির দর্শন বা সামাজিক মূল্যমানতা দিয়ে কাব্যের বিচার চলে না। কবিতা অনেক সময়ই নিঃসংলগ্ন, যা বর্ণাঢ্য কিন্তু শ্রেয়োধর্মী। এই কবি শেষপর্যন্ত উপলব্ধি করেছেন মুক্তি নেই ধ্যানে বা বিজ্ঞানে। চাই সবকিছুর সমন্বয়। আধুনিক কবিদের সকলের মধ্যেই দেখা গেছে মৃত্যু সচেতনতা। অন্যান্য কবিদের ক্ষেত্রে এই মৃত্যুচেতনার সঙ্গে মিশে আছে সমকালীন যুগমানসের অবক্ষয় চেতনা। অমিয় চক্রবর্তীর কাছে এই চেতনায় মিশে আছে ঘরে ফেরার আকুলতা -

> "পৌঁছতে হবেই বাড়ি
> কেনাবেচা শেষ ক'রে
> গান কণ্ঠে ভ'রে
> ঘরে ফেরা দিনক্ষণে
> দিয়ো পাড়ি।
> দীপ জ্বলে ঘরের আঙনে॥"[১৪]

শেষপর্যন্ত একধরনের প্রজ্ঞানিয়ন্ত্রিত মিস্টিক চেতনার সার্থক প্রকাশ হয়ে রইল অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা, যা আসলে এই মানবসংসারের আশ্চর্য রঙিন কাহিনী –

> "পৃথিবীতে এসে যা দেখা গেল তার বিমিশ্র সহজ একটি আক্ষরিক পরিচয়, সাক্ষীর বিমুগ্ধ আত্মভাষায় স্বীকৃতি। কিছু আপত্তি, কিন্তু সব বিরুদ্ধতা ভুলিয়ে দেওয়া আশ্চর্য সংসারের স্রোতধ্বনি, আশ্চর্য রঙিন কাহিনী, যা দেখাশোনা যায় না।"[১৫]

কবিতার প্রকরণ শিল্পের দিক থেকে এক অন্য ধরনের আধুনিকতা নিয়ে এসেছিলেন অমিয় চক্রবর্তী। তাঁর কাব্যরচনার মধ্যে আছে আপাত সরল এক বিস্ময়কর প্রসাদগুণ –

> "আধুনিক প্রকরণের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির প্রায় সবই তার কাব্যে বর্তমান, যেমন মিতব্যয়িতা, উল্লম্ফন, শব্দার্থতত্ত্বের বিপর্যয়, পরিভাষার বহুল ব্যবহার, কথোপকথন রীতির মিশ্রণ, জেমস জয়সের মতো টেলিস্কোপীয় শব্দের ব্যবহার ইত্যাদি।"[১৬]

তিরিশের অন্যান্য কবিদের মতোই বিষ্ণু দেও (১৯০৯-১৯৮২) বুঝেছিলেন আধুনিক বাংলাকাব্যের মুক্তি রবীন্দ্র অনুসরণে নয়। তিনি সচেতন সামাজিক সমবায়ের পথেই কাব্যসাধনা করেছেন। আধুনিক কাব্যের ক্লান্তি, জিজ্ঞাসা, সংশয়ের মধ্যে থেকেই বিষ্ণু দে নিজের মত করে উপনীত হয়েছেন বিশ্বাসের বন্দরে। বিষ্ণু দে বুঝেছিলেন ঐতিহ্য সচেতন হয়েই

ঐতিহ্যকে অতিক্রম করে যেতে হয়। তবে বিষ্ণু দের ঐতিহ্য দেশ কাল নিরপেক্ষ। তিনি মনে করতেন সমসাময়িক কাব্য আন্দোলনের গতিপ্রকৃতিকে সম্যক উপলব্ধি করেই এগোতে হবে কাব্যচর্চার পথে। অবশ্য এরকম ভাবনায় তিনি ভাবিত হয়েছিলেন এলিয়ট পাঠ করেই –

> "A development which abandons nothing enroute, which does not superannuate either Shakespeare, or Homer, or the rock drawing of the Magdalenian draughtsman."[১৭]

বিষ্ণু দে বুঝেছিলেন শেষপর্যন্ত কবিকে হতে হয় জনমানসের চেতনার প্রতিনিধি –

> "A poet consistently and persistently has to try to be a people's peot. In one's end is one's beginning."[১৮]

সমকালীন যুগের ক্লান্তি, ব্যক্তির উদ্দেশ্যহীনতা এবং অধ্যাত্মজীবন সম্পর্কে যে আগ্রহহীনতা তার মাঝে দাঁড়িয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টিবলে এলিয়ট যথার্থই বুঝেছিলেন ইউরোপীয় সভ্যতাকে। তিনি সেই সভ্যতাকে দেখেছিলেন পোড়ো জমির চিত্রকল্পে। এলিয়টের মতই বিষ্ণু দেও বুঝেছিলেন তার সমকালীন মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবন একধরনের চোরা বালির আবর্তে বন্দি। এই রুগ্নসভ্যতার ফাঁপা মানুষগুলোর প্রতি বিষ্ণু দের কোনো করুণা ছিল না। তবে এলিয়ট যেমন শেষপর্যন্ত জীবনের অর্থ অনুসন্ধান করেছিলেন ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করে, বিষ্ণু দে তেমন করে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে অকুণ্ঠ আস্থা স্থাপন করেননি। মার্কসবাদের প্রভাবও বিষ্ণু দের ওপর যথেষ্টই আছে।

বিষ্ণু দের "ইতিহাসচেতনা অতীতমুখী নয়, ভবিষ্যৎমুখী। সে-ইতিহাসের রঙ্গভূমি সমকালীন সমাজ, তার পশ্চাতে রয়েছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ-লব্ধ দৃঢ় প্রত্যয় ও সাম্যবাদী বিপ্লবের পথে সমাধান হবে এই বিশ্বাস।"[১৯] আত্মময় রোম্যান্টিক সৌন্দর্যবিলাস থেকে সরে এসে বিষ্ণু দে অবতীর্ণ হয়েছিলেন কঠোর বাস্তবের ভূমিতে। যুদ্ধক্লান্ত পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে বিষ্ণু দে কোনও রোম্যান্টিক স্বপ্নকল্পনায় আত্মতুষ্টি অনুভব করেননি। স্বাধীনতা উত্তর দরিদ্র ভারতবর্ষে মানব চৈতন্যের সার্বিক অবক্ষয় তাকে কোনো আশার আলো দেখাতে পারেনি -

> "এ নরকে
> মনে হয় আশা নেই জীবনের ভাষা নেই,
> যেখানে রয়েছি আজ সে কোনও গ্রামও নয়, শহরও তো নয়,
> প্রান্তর পাহাড় নয়, নদী নয়, দুঃস্বপ্ন কেবল,
> সেখানে মজুর নেই, চাষা নেই,
> যেখানে রয়েছি আজ মনে হয় আশা নেই,
> বাঁচাবার আশা নেই, বাঁচবার ভাষা নেই,
> সেখানে মড়ক অবিরত
> সেখানে কান্নার সুর একঘেয়ে' নির্জলা আকালে
> মরমে পশে না আর, সেখানে কান্নাই মৃত
> কারণ কারোই কোনো আশা নেই
> অথবা তা এত কম, যে কোনো নিরাশা নেই।
> চৈতন্যে মড়ক।"[২০]

'চোরাবালি' (১৯০৮), 'পূর্বলেখ' (১৯৪১), 'সাতভাই চম্পা' (১৯৪৫), 'সন্দীপের চর' (১৯৪৭), 'অন্বিষ্ট' (১৯৫০), 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' (১৯৫৩), 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' (১৯৫৮), 'স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যত' (১৯৬৩), 'সেই অন্ধকার চাই' (১৯৬৬), 'উত্তরে থাকো মৌন' (১৯৭৭) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থগুলিতে বিষ্ণু দের কাব্যপ্রচেষ্টা ছড়িয়ে আছে। দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার সেতুবন্ধন বিষ্ণু দের মত খুব কম কবিই করতে পেরেছেন। সাধারণ মানুষের বেদনার মধ্যে বিপ্লবের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 09
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 64 - 76
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রস্তুতি অনুভব করেছেন বিষ্ণু দে। দেশী বিদেশী নানা কবির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তিনি। বিশেষ করে এলিয়ট, লুই আঁরাগ, ফেদেরিকো গারসিয়া লোরকা প্রমুখের প্রভাব বিষ্ণু দের ওপর সবিশেষ।

জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী— এই পঞ্চপান্ডব ছাড়া আর যে তিনজন কবির কথা তিরিশের আধুনিক কবিতার আলোচনায় মনে রাখা দরকার তারা হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), অজিত দত্ত (১৯০৭-১৯৭৯) এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬)। বিশেষ করে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় মধ্যবিত্ত মনের যাপনযন্ত্রণার ছবি স্বতন্ত্র মাত্রা পেয়েছে। সাধারণ জনগণের কবি হবার ঘোষণা নিয়েই বাংলা কবিতায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের আবির্ভাব।

> "প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর কাব্যে সংশয়-সন্দেহ, যুক্তি-জিজ্ঞাসা, বিদ্রোহ-বিক্ষোভকে রূপ দিয়েছেন। তিনি বুদ্ধদেব বসুর মতো প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে বন্দী মানবাত্মার জন্য ব্যথিত; জীবনের কুৎসিত, নিষ্ঠুর, দুঃখ-দৈন্যময় রূপ সম্বন্ধে সচেতন, তবু তার বিক্ষোভের সঙ্গে নজরুলের বিদ্রোহই তুলনীয়।"[২১]

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা স্পষ্ট এবং অকপট। সমস্ত রকম জটিলতা এবং নৈরাশ্যের মধ্যে দাঁড়িয়েও তিনি তাঁর 'প্রথমা' (১৯৩২), 'সম্রাট' (১৯৪০), 'ফেরারী ফৌজ' (১৯৪৮), 'সাগর থেকে ফেরা' (১৯৫৬), 'হরিণ চিতা চিল' (১৯৬১) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের অসংখ্য কবিতায় স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন মানুষের মনোলোককে। তিনি যেন কবিতার মাধ্যমে জটিল জীবনাবর্তের ওপর উজ্জ্বল আলো ফেলতে চেয়েছেন।

তিরিশের পর থেকেই দশক বিভাজনে কবিতার বর্ণপরিচয় অনুধাবনের একটা প্রবণতা বাংলার কবি এবং কাব্য সমালোচকদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে যায়। তিরিশের পরে এল চল্লিশের দশক। এই সময়বৃত্তে বিশ্ব ইতিহাসের প্রেক্ষাপটেই ঘটেছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১৯৩৬-এ স্পেনের গৃহযুদ্ধ, ১৯৩৭-এ চীন-জাপান যুদ্ধ। এরই মধ্যে ১৯৩৯-এ শুরু হল দ্বিতীয় মহাসমর। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৪২-এ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে উত্তাল হল বঙ্গভূমি সহ ভারতবর্ষ। বাংলায় সেই ১৯৪২ সালেই প্রতিষ্ঠিত হল ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ। তারপর ১৯৪৩ সালের সেই ভয়াবহ মন্বন্তর। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠিত হল ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে। এরপর ১৯৪৬-এ দেখা গেল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎস রূপ। আর তারপর ১৯৪৭-এ ঘটে গেল বাঙালি জাতির জীবনের সবথেকে বড় ট্র্যাজেডি। স্থায়ীভাবে ভেঙ্গে দু'টুকরো হল বঙ্গভূমি।

সমকালীন সমাজ-রাজনীতি এবং ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে চল্লিশের যে কবিরা কবিতা চর্চায় এগিয়ে এলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৫), সুকান্ত ভট্টাচার্য্য (১৯২৬-১৯৪৭), রাম বসু (১৯২৫-২০০৬), সিদ্ধেশ্বর সেন (১৯২৬-২০০৮), কৃষ্ণ ধর (১৯২৬) প্রমুখ। এদের কবিতার প্রধান পরিচয় এই যে –

> "তা তীব্রভাবে এবং অত্যন্ত গভীর অর্থে সমকাল-সচেতন ও ইতিহাস-মনস্ক। কিছুটা সরলতর অর্থে এ-কবিতা সাম্যবাদী মানসিকতা দ্বারাও উদ্বুদ্ধ।"[২০]

অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, সমাজমনস্ক বা সমকাল সংলগ্ন প্রতিবাদী কবিতার ধারা চল্লিশে প্রাধান্য পেলেও এই সময়ই একদল কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন - যাদের কবিতায় আছে চিরায়ত উপলব্ধির প্রকাশ; আছে প্রেম এবং নিসর্গের অপরূপ বাণীরূপ। এই যারা সমকালীন সময়ের উত্তাপকে গ্রহণ করেও কবিতা চর্চার ক্ষেত্রে মান্যতা দিলেন সৌন্দর্যমুগ্ধ বিস্ময়বোধকে তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নাম অশোকবিজয় রাহা (১৯১০-১৯৯০), অরুণ কুমার সরকার (১৯২১-১৯৮০), নরেশ গুহ (১৯২৪-২০০৯), বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৬), অরুণ ভট্টাচার্য্য (১৯২৫), হরপ্রসাদ মিত্র (১৯১৭-১৯৯৪), রমেন্দ্রকুমার আচার্য্য চৌধুরী (১৯২২), বাণী রায় (১৯১৮-১৯৯২), রাজলক্ষ্মী দেবী (১৯২৭) প্রমুখ।

সমাজমনস্ক মানবতাবোধের অনুপ্রেরণাতেই কবিতা রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন কবি অরুণ মিত্র (১৯০৯-১৯৬৯)। অরুণ মিত্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রান্ত রেখা' প্রকাশিত হয় ১৯৪৩-এ। পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'ঘনিষ্ঠ তাপ', 'উৎসের দিকে' 'শুধু রাতে শব্দ নয়' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে অরুণ মিত্রের কাব্যচর্চার উজ্জ্বল স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে।

> "তাঁর কবিতায় সমকালীন জীবন, জীবনের সংকট যেমন আছে তেমনি রয়েছে যুগযন্ত্রণার অতীত চিরন্তন প্রেম ভালোবাসার ইতিবৃত্ত। কবি কখনো আবার পাশ্চাত্য রোমান্টিক কবিদের মতো সমকালীন জীবনের

যন্ত্রণাদগ্ধ রূপ থেকে সরে আসেন প্রকৃতির অপরূপ নৈসর্গিক জগতে-যে জগতের মধ্যে তিনি নিবিষ্ট থেকে তাঁর স্বপ্ন সন্ধান করেন।”[২২]

“এক-একটা শান্ত দিন নিয়ে বিভোর হই
তাকে মৃদু নদী দিয়ে ঘিরে রাখি
কুয়াশায় মুড়ে রাখি
ভোর ভোর আলো কিম্বা গোধূলির গভীরে নিয়ে যাই
আমার জানাশোনা মানুষেরা স্তিমিত হয়ে হয়ে নিবে যায়
তাদের কথাগুলো হিম হয়ে থাকে
হিম শীতের রোদ আর ছায়া
কোন্ জলের শব্দ
নিস্তব্ধ মাঠ
মনের কপাট খুলে এইসব সংগ্রহ করি।”[২৩]

চল্লিশের কবিতার আর এক প্রধান নাম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র (১৯১১-১৯৭৭)। ১৯৪৪-এ তাঁর প্রথম কবিতা সংকলন ‘মধুবংশীর গলি’ প্রকাশিত হয়। মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়, সমকালীন দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের যন্ত্রণা, বিশ্বযুদ্ধের নারকীয়তা, কালোবাজারী, মজুতদারী ইত্যাদির বাস্তব ছবি প্রকাশিত হয়েছিল এই সংকলনে। এই সংকলনের ‘মধুবংশীর গলি’ নামক দীর্ঘ কবিতাটিতে কবি - “নগরবাসী এক সাধারন মানুষের নৈরাশ্য, প্রেম, সমাজজিজ্ঞাসা, ক্রোধ আর বিপ্লবের বাণী শুনিয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দিনগুলিতে কলকাতার মতো এক উপনিবেশ-নগরীর অভ্যন্তর উদ্‌ঘাটিত হয়েছে কবিতাটিতে।”[২৪]

চল্লিশের কাব্যধারার প্রধান সুরটি ধ্বনিত হয়েছে দিনেশ দাসের (১৯১৩-১৯৮৫) ‘কাস্তে’ কবিতায়-

“বেয়নেট হ'ক যত ধারালো—
কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু!
শেল আর বম্ হ'ক ভারালো
কাস্তেটা শান দিও বন্ধু!
নতুন চাঁদের বাঁকা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালবাসতে?
চাঁদের শতক আজ নহে তো
এ-যুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে!”[২৫]

দিনেশ দাসের নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে এই কবিতা। ‘কবিতা’ (১৯৪২), ‘ভুখ-মিছিল’ (১৯৪৪), ‘কাঁচের মানুষ’ (১৯৬৪), ‘অসংগতি’ (১৯৭২), ‘রাম গেছে বনবাসে’ (১৯৮১) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে দিনেশ দাস সমাজ এবং পরিবেশ সচেতন কাব্যচর্চার এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন। শ্রমজীবী মানুষের জয়গান গেয়ে বাংলা কবিতার ইতিহাসে অনন্য হয়ে রয়েছেন এই কবি।

চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতার অগ্নিক্ষর নাম সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩)। কবিতা লেখার প্রথম পর্বে সুভাষ মুখোপাধ্যায় যুক্ত হয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ‘কবিতা’ পত্রিকার সঙ্গে। রাজনৈতিক বক্তব্যকে কবিতা করে তোলবার অসমান্য দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এই কবি। ১৯৪০-এ প্রকাশিত ‘পদাতিক’ কাব্যগ্রন্থেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিজের জাত চিনিয়েছিলেন!

“সমগ্র চল্লিশের দশক জুড়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা প্রবাহিত ছিল বাংলার সাম্যবাদী আন্দোলনে এবং বাংলার কবিতা পাঠকের প্রাণে একই সঙ্গে।”[২৬]

বাঙালি পাঠকের হৃদয়ে একই সঙ্গে নতুন পৃথিবী এবং নতুন কবিতার স্বপ্ন জাগিয়েছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 09
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 64 - 76
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত
শান-বাঁধানো ফুটপাথে
পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ
কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে
হাসছে।
ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।"[২৭]

"এ এক অসাধারণ বাচনভঙ্গি, ছন্দ, সংলাপে মানবতাবোধের এই জাগরণ বাংলা কবিতায় ইতিপূর্বে পাইনি আমরা। এ ধরনের কবিতার মাধ্যমেই যথার্থ অর্থে বাংলা কবিতার নাবালক দশার অবসান হ'লো।"[২৮]

চল্লিশের উত্তাপের মধ্যেই আশ্চর্য মধুর রোম্যান্টিক কবিতা নিয়ে বাংলা কবিতায় হাজির হয়েছিলেন কবি রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী। 'আরশিনগর' (১৯৬১), 'ব্রহ্মা ও পুঁতির মউরি' (১৯৮৫), 'অলংকৃত তীর' (১৯৮৫) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা এই কবি। চল্লিশের শব্দসচেতন এই কবির কবিতায় রয়েছে ভাষার ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত এক অখণ্ড জীবনবোধ। চল্লিশের রাজনীতি, সমাজনীতির মধ্যে দাঁড়িয়ে কবিকল্পনায় এক অপূর্ব মায়ারণ্য নির্মাণ করেছিলেন কবি অশোকবিজয় রাহা (১৯১০-১৯৯০)। প্রকৃতই এক বিশুদ্ধ কবিসত্তার অধিকারী ছিলেন এই কবি।

"রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ আর জীবনানন্দের পরেও যে স্বতন্ত্র সৌন্দর্যলোক নিসর্গের বুকে রচনা করতে পেরেছিলেন অশোকবিজয় রাহা তা নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র।"[২৯]

চল্লিশের কবিতার আর এক প্রধান নাম নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। চল্লিশের দশকে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা রচনার সূত্রপাত। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রধানত রোম্যান্টিক, তবে তার রোম্যান্টিক কবিমানস কখনও সমাজের ক্ষত এবং বেদনার বিশ্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। কখনও পরম স্নেহে কখনও সচকিত প্রতিবাদে সামাজিক অসঙ্গতির মূলে আঘাত হেনেছেন নীরেন্দ্রনাথ -

"খানিক আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে চৌরঙ্গীপাড়ায়
এখন রোদ্দুর ফের অতিদীর্ঘ বল্লমের মতো
মেঘের হৃদপিণ্ড ফুঁড়ে
নেমে আসছে,
মায়াবী আলোয় ভাসছে কলকাতা শহর।
স্টেট বাসের জানালায় মুখ রেখে
একবার আকাশ দেখি একবার তোমাকে।
ভিখারী মায়ের শিশু,
কলকাতার যীশু,
সমস্ত ট্রাফিক তুমি মন্ত্রবলে থামিয়ে দিয়েছ।"[৩০]

প্রেম, আত্মগত উপলব্ধি, নিসর্গ সৌন্দর্য সবকিছুই প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছিল চল্লিশের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৯২০-১৯৮৫) কবিতায়। তবে এই কবির কবিতায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে দেশের অগণিত অসহায় দুর্বল মানুষের আর্তনাদের ভাষা। চল্লিশের কবিতার অন্যতম কণ্ঠস্বর কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -

"হোক পোড়া বাসি ভেজাল মেশানো রুটি
তবু তো জঠরে বহ্নি নেবানো খাঁটি
এ এক মন্ত্র! রুটি দাও, রুটি দাও,

বদলে বন্ধু যা ইচ্ছে নিয়ে যাও,
সমরখন্দ বা বোখারা তুচ্ছ কথা
হেসে দিতে পারি স্বদেশেরও স্বাধীনতা।"[৩১]

ব্যক্তিমনের আবেগ উপলব্ধির সাথে এভাবেই চল্লিশের কবিতার ভাষায় উঠে এসেছে সহজ সরল জীবনের অভিজ্ঞতা।

> "তার একদিকে প্রেম, জীবনযন্ত্রণা, অন্যদিকে মেহনতী, সর্বহারা মানুষের দীর্ঘশ্বাস, দুঃখ, দুটোই পাশাপাশি কবিতাকে সম্মানজনক জায়গায় উপস্থিত করলো।"[৩২]

সুকান্ত ভট্টাচার্য্যকে বাদ দিয়ে চল্লিশের কবিতা বিষয়ক আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই কবির অকাল প্রয়াণ নিশ্চিন্তভাবেই বাংলা কবিতার এক বড় ক্ষতি। সুকান্তের 'ছাড়পত্র' বাঙালি কাব্যপাঠকের অন্যতম প্রিয়গ্রন্থ। সমকালীন সময়ের দুঃখ-ব্যথার এক অনুপম চালচিত্র কিশোর সুকান্ত তুলে ধরেছিলেন তাঁর লেখায় -

"আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,"[৩৩]

সমকালীন "ক্ষুধার গদ্যময় পৃথিবীতে ইতিহাস গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে তিনি এসেছিলেন, প্রাণপণে পৃথিবীর সমস্ত বিষমতার জঞ্জাল সরাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন, মেহনতী মানুষের সঙ্গে কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা অর্জনের চেষ্টা করেছিলেন সততায়, একনিষ্ঠায়।"[৩৪]

এভাবেই চল্লিশের দশক বাংলা আধুনিক কবিতার ইতিহাসে এক বিশেষ কালপর্ব হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। সমকালীন সময়ের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় কবিদের কলমে উঠেছে সময়ের তাপ-উত্তাপ এবং জীবনের জলছবি। আসলে জীবন এবং সময় পরস্পর হাত ধরে চলে, তাই সময়ের দাবীকে অস্বীকার করতে পারেন না সৃষ্টিশীল মানুষ। হয়তো শিল্পের পক্ষে এই অবস্থা অনুকূল কিনা বা সময়ের সঙ্গে শিল্পের যোগাযোগ এতটা গভীর হওয়া উচিত কিনা তা বিচার সাপেক্ষ, কিন্তু বাংলা কবিতার ইতিহাসে এই পরিস্থিতি ছিল অনিবার্য "...চল্লিশের কবিদের অনেকটা শক্তি রাজনীতির সেবায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল। এ জন্যে অবশ্য আফসোস করার কারণ দেখছি না। মাতৃভূমির পরাধীনতা, বিশ্বজোড়া যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং দুর্নীতির মধ্যে থেকে কোনো যুবকের পক্ষেই সেদিন চোখ বুজে ধ্যান করা সম্ভব ছিল না।"[৩৫]

তিরিশ এবং চল্লিশের দশকের আগে সেই অর্থে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠেনি। ইতিপূর্বে বাংলা কবিতার কেন্দ্র ছিল মূলত কলকাতা। অবশ্য বুদ্ধদেব বসু বা অজিত দত্তরা ঢাকায় বসেই তাদের কাব্যচর্চার সূচনা করেছিলেন। কিন্তু তারাও ছিলেন হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই অন্তর্গত। চল্লিশের দশকের পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি যে কবি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটল তাদের অনেকের মধ্যেই সক্রিয় ছিল পাকিস্তান চেতনা। স্বাধীনতার ক্ষণ যত এগিয়ে আসছিল তত তারা পাকিস্তানপন্থী এক ভিন্ন ধারার জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রকাশ করছিলেন তাদের লেখায়। পঞ্চাশের দশকের আগে পর্যন্ত পূর্ববঙ্গীয় বাংলা কবিতায় সক্রিয় ছিল দু'রকম চেতনা। এর মধ্যে একটি হল পাকিস্তানি বা ইসলামি ধারা, অন্যটি মানবতাবাদী বা প্রগতিশীল ধারা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বপ্নে বিভোর ইসলামি ধারার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কবি সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২)। তিনি মনে করতেন –

> "প্রয়োজন হলে আমাদের রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিতে হবে।"[৩৬]

এই ধারারই আর একজন কবি হলেন ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)। এ কথা স্পষ্ট করেই বলা যায় যে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন এই কবিরা বাংলা কবিতার চিরাচরিত ঐতিহ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। অন্য দিকে তিরিশ চল্লিশের বাংলা কবিতায় যে আধুনিকতা এসেছিল তার মূল সুরকে আত্মস্থ করে যে সকল পূর্ববঙ্গীয় কবি কাব্যচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫) এবং আবুল হোসেন (১৯২২)। এদের কবিতায় আবহমান কালের বাংলা কবিতার ঐতিহ্যের প্রকাশ থাকলেও চল্লিশের দশকের পূর্ববাংলার কবিতার মূলসুর কিন্তু

পাকিস্থানপন্থী ইসলামি চেতনা। এই ইসলামি চেতনার কবিরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনায় দারুণ ভাবে উল্লসিত হয়েছিলেন, কারণ ইতিপূর্বে কবিতা চর্চায় অগ্রণী প্রধান প্রধান অধিকাংশ কবিই ছিলেন হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ।

অবশ্য এই ইসলামি চেতনা বেশিদিন পূর্ববঙ্গের কবিতায় স্থায়ী হয়নি। কারণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের মোহভঙ্গ হয়। পাকিস্তানের অবাঙালি শাসক গোষ্ঠী পূর্ববঙ্গীয় বাঙালিদের উপর শুরু করে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক শোষণ। প্রগতিশীল মানবতাবাদী কবিরা এই পাকিস্তানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। চল্লিশের দশকের শেষদিক থেকেই পূর্ববঙ্গের মাটিতে ভাষা আন্দোলনের বীজ উপ্ত হচ্ছিল। পঞ্চাশের শুরুতেই অলৌকিক একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে আবার ফিরিয়ে আনল বাঙালি চেতনার মূলস্রোতে। এরপর থেকেই পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ কবির লেখায় ফিরে এসেছে –

> "অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, দেশজ উত্তরাধিকারে আস্থা, বাংলা সাহিত্যের প্রবহমান ঐতিহ্যের বিশ্বাস ও মানবতাবাদী জীবনসংলগ্ন অনুভূতি।"[৩৭]

Reference:

১. বসু, বুদ্ধদেব, 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক', *একালের সমালোচনা সঞ্চয়ন,* কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সংস্করণ : জুন ১৯৮০, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৮, পৃ. ১৫১

২. বসু, বুদ্ধদেব, 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত, 'আধুনিক বাংলা কবিতা প্রেক্ষিত ও সূচনা', *কবিতা নিয়ে,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪১১, পৃ. ১৫

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত, *কবিতা নিয়ে,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১

৫. Holroyd, Stuart, *Emergence from chaos*, Victor Gollancz, London 1957, P. 120

৬. দাশ, জীবনানন্দ, 'মৃত্যুর আগে', *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা,* ভারবি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৫৪, দ্বাদশ মুদ্রণ এপ্রিল ২০০৭, পৃ. ১৬

৭. আচার্য্য, দেবেশ কুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট ২০০৪, দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ২৪৭

৮. ত্রিপাঠী দীপ্তি, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত', *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগষ্ট ১৯৫৮, ষষ্ঠ সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ১৭৪

৯. দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ, 'কাব্যের মুক্তি', পরিচয়, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৮, পৃ. ২১

১০. বসু, বুদ্ধদেব, 'শ্যপভ্রষ্ট', *কবিতা সংগ্রহ* (প্রথম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৮০, তৃতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ২২

১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত, *কবিতা নিয়ে,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

১২. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, 'বুদ্ধদেব বসু', *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

১৩. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, 'অমিয় চক্রবর্তী', *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

১৪. চক্রবর্তী, অমিয়, 'কংগো নদীর ধারে', *কবিতা সংগ্রহ* (দ্বিতীয় খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৭৯, দ্বিতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ২০০৭, পৃ. ৫৪

১৫. চক্রবর্তী, অমিয়, 'ছন্দ ও কবিতা', বুদ্ধদেব বসুকে লেখা চিঠি, প্রকাশিত হয়েছিল 'কবিতা' পত্রিকার ১৩৬২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায়, পৃ. ২৬১

১৬. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, 'অমিয় চক্রবর্তী', *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২

১৭. Eliot T.S., *Points of View*, Faber & Faber, London 1951 P. 27

১৮. Bishnu Dey, 'Mr. Eliot Among the Arjunas', *T.S. Eliot-a symposium*, Published by Frank Cass & Co. Ltd., 10 Woburn Walk, London, Third impression 1965, P. 102

১৯. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, 'বিষ্ণু দে', *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১

২০. দে, বিষ্ণু, *স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৮০, প্রথম দে'জ সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৯৭, দ্বিতীয় সংস্করণ : আগষ্ট, ২০০১, পৃ. ১১

২১. আচার্য্য, দেবেশ কুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

২২. আচার্য্য, দেবেশ কুমার, 'অরুণ মিত্র', *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,* আধুনিক যুগ (১৯৫০-২০০০), ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০১০, পৃ. ২৪২

(১৯৫০-২০০০), ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট ২০১০, পৃ. ২৪২

২৩. মিত্র, অরুণ, 'এক-একটা শান্ত দিন', *দুই বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিতা,* সম্পাদনা : সৈয়দ সামসুল হক, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মডেল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা ১৯৯৭, দ্বিতীয় সংস্করণ বইমেলা ২০০৮, পৃ. ৩১৩

২৪. চক্রবর্তী, সুমিতা, 'চল্লিশের কবিতা', *আধুনিক কবিতার ইতিহাস,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

২৫. দাস, দিনেশ, 'কাস্তে', *কালের কবিতা,* সম্পাদনা : শান্তনু দাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৮২, দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন ১৯৯৯, পৃ. ১১৮

২৬. চক্রবর্তী, সুমিতা, 'চল্লিশের কবিতা', *আধুনিক কবিতার ইতিহাস,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

২৭. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, 'ফুল ফুটুক না ফুটুক', *কালের কবিতা,* সম্পাদনা: শান্তনু দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

২৮. বসু, বুদ্ধদেব, 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক', *একালের সমালোচনা সঞ্চয়ন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

২৯. চক্রবর্তী, সুমিতা, 'চল্লিশের কবিতা', *আধুনিক কবিতার ইতিহাস,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

৩০. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, 'কলকাতার যীশু', *কালের কবিতা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

৩১. চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র, 'রুটি দাও', *বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৪, তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৩০

৩২. দাস, শান্তনু, 'ভূমিকা', *কালের কবিতা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৩৩. ভট্টাচার্য্য, সুকান্ত, 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি', *সুকান্ত সমগ্র,* সম্পাদক : সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৭, পৃ. ৪

৩৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত, '*আধুনিক বাংলা কবিতায় বিষণ্ণতা বোধ',* রূপসী বাংলা, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২৫৩

৩৫. সরকার, অরুণ কুমার, 'চল্লিশের চোখে চল্লিশের কবিতা', *তিরিশের কবিতা এবং পরবর্তী,* প্যাপিরাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮১, পৃ. ১৪

৩৬. ভট্টাচার্য, সাগর, 'পূর্ব-পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ : কবিতার মানচিত্র', *আজকের প্রতিভাস,* প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৩. পৃ. ২২৮

৩৭. ভট্টাচার্য, সাগর, 'পূর্ব-পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ : কবিতার মানচিত্র', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯